সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাজী আবদুল ওদুদের ‘নবপর্যায়'-এর সমাজভাবনা

Vol. 45 | No. 1 | 2001

Check for updates

Volume	45
Issue	1
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নুরুল আমিন
Published online	October 1, 2001
DOI	10.62328/sp.v45i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v45i1.6
Pages	126-153
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কাজী আবদুল ওদুদের 'নবপর্যায়'-এর সমাজভাবনা

নুরুল আমিন*

কাজী আবদুল ওদুদের প্রথম প্রবন্ধ-সংকলন নবপর্য্যায়[১] (প্রথম খণ্ড)। এতে সাতটি প্রবন্ধ : "মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" (১৩৩২), "সাহিত্যে সমস্যা", "মানব-মুকুট" (চৈত্র ১৩৩১), "পণ্ডিত সাহেব" (১৩৩২), "কাজি ইমদাদুল হক স্মরণে" (১৯২৬), "সৃষ্টির কথা" (১৩৩২), "সম্মোহিত মুসলমান" (১৩৩৩); এবং শুরুতে সূচিপত্রের বাইরে একটি কবিতাও রয়েছে। ১৩৩৩ সালে প্রকাশিত এর প্রথম সংস্করণের গ্রন্থারম্ভে ওদুদ জানিয়েছিলেন, বইখানির নামকরণ করেছেন তাঁর 'শ্রদ্ধেয় বন্ধু, অধ্যাপক মৌলবী আবুল হুসেন, এম এ, বি এল।'[২] ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রধান কর্মী-পুরুষ অধ্যাপক আবুল হুসেন কেন বইখানির এই নাম রেখেছিলেন বুঝতে কষ্ট হয় না। বইখানিতে 'নবপর্যায়' শীর্ষক কোনো প্রবন্ধ না থাকলেও এ-বইয়ের কোনো কোনো প্রবন্ধের বক্তব্যে সামগ্রিকভাবে সমাজের নতুন একটি পর্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়; বিশেষভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজে নব জাগরিত একটি পর্যায়কে কামনা করা হয়েছে, তাই হয়ত নবপর্যায় নাম। ওদুদের ভাষায় বললে, 'অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এক নব-জাগরণের পূর্ব-লক্ষণ স্ফূরিত হচ্ছে এর পাতায় পাতায়।'[৩] মানব-মুকুট সম্পর্কে বলা কথাগুলো ওদুদের নিজের জন্যও প্রযোজ্য। মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর মতো ওদুদের কলমের মুখেও এতে এমন অনেক কথা 'বেরিয়েছে যা বাংলার মুস্‌লিম সমাজের কাছে এক অতি বড় সুসংবাদ– অন্ততঃ মুসলমানের নব-জাগরণের প্রতীক্ষায় যাঁরা বসে আছেন তাঁদের চোখে এ এক চমৎকার পূর্ব-সূচনা।'[৪] ১৩৩১ চৈত্রে লেখা ওদুদের ডায়েরি থেকে জানা যায়, 'মুসলমান সমাজের এক নব পর্যায়ের জীবন' তাঁর ভাবনায় ভাসছে; 'শুধু টাকা পয়সা মান প্রতিপত্তির জীবন নয়— ক্ষমা, সংযম, জাগ্রত মাহাত্ম্য এরই সুষমামণ্ডিত যে জীবন' সেটি।[৫]

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

নবপর্যায় যে সময়ের রচনা, সে-সময় তরুণ ওদুদ পরাধীন দেশমাতৃকার কথা যেমন ভেবেছেন, তার চেয়ে অধিক ভেবেছেন তাঁর স্বসম্প্রদায় মুসলমানের মুক্তির কথা, বিশেষত বাংলার মুসলমান সমাজের মুক্তির কথা। বলা বাহুল্য, *নবপর্যায়* দুই খণ্ডেরই অধিকাংশ প্রবন্ধের রচনাকাল ১৯২৫-২৬; বাকি ক'টি প্রবন্ধ ১৯২৪, ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে লেখা। ঠিক এ-সময়েই (১৯২৪-১৯২৮) রচিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরি 'নানা-কথা'। ডায়েরিতে ১মে ১৯২৬-এ তিনি লিখেছেন :

> বাংলাদেশের উপর বিশ্বাস হচ্ছে। এখানকার হিন্দু-মুসলমান সকলেরই ভিতরে জিনিস আছে। আচ্ছা আমি কি মুসলমানকেই বেশি ভালবাসি? তা না হলে, হিন্দুর কীর্তি আর মুসলমানের কুকীর্তি শুনে কেন আমার মন এত বিষণ্ন হল? — না, আমি যে কেবল মুসলমানকেই ভালবাসি, তারই মঙ্গল চাই, তা সত্য নয়। মোটের উপর আমি মানুষের কল্যাণ চাই। হিন্দু সেই কল্যাণের পথে সামান্য দু'এক পা এগিয়েছে, মুসলমান একপাও এগোয় নাই। তাই মুসলমানের জন্য আমার এত দরদ। তা ছাড়া আমি এদেরই ভিতর জন্মেছি, নাড়ীর টান যে একেবারেই নাই তা নয়। কিন্তু মুসলমানের জন্য আমার ভালবাসা যে এত গভীর আর এত বেদনাকাতর তা এই জন্যই যে সে আজ বড় দুঃস্থ, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে দুঃস্থ। (পৃ. ৩১৩)

শুধু তাই নয়; ১১ জুন ১৯২৬-এর ডায়েরিতে তিনি লিখছেন :

> ...আমার দুঃখ আমার হতভাগ্য সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্য। "নবপর্যায়" বাণী মন্দিরকে আর দেব না। তার কারণ হিন্দু বয়কট নয়, এতে মুসলমানদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে; মুসলমান দোকান থেকেই, অন্ততঃ মুসলমান দোকানের নামে বার হোক। মুসলমান সমাজে নব সৃষ্টির প্রয়োজন, তাই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে সেখানে বলতে হবে। মুসলমানকে জাগানো ভারত ও জগতের জন্য দরকারি। (পৃ. ৩১৫)

এ-সময় উপমহাদেশের নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমানে সংঘাত যে চলেছে তার ইঙ্গিতও ডায়েরিতে রয়েছে।[৬] এর পেছনে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার কথা ওদুদ উল্লেখ করেছেন। এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন কামনা করে তিনি বলেছেন, 'মানুষের কল্যাণ এ কথা বাদ দিয়ে হিন্দু অথবা মুসলমানের কল্যাণ, একথা ভাবতে মনে একটু বেদনা লাগে।'[৭] তবুও উপায় নেই; বিশ্বমানবতার পূজারী হয়েও ওদুদকে পিছিয়ে পড়া তাঁর স্বসম্প্রদায়কে নিয়ে বেশি ভাবতে হয়েছে। কারণ, তাঁদের ভেতর নব-চেতনা সৃষ্টির বিকল্প কিছু তিনি দেখছেন না, যা থেকে বর্তমান জগতের প্রেক্ষাপটে মুসলমান সমাজে সংস্কার সাধন সম্ভব। তাঁর প্রশ্ন, 'জীবনকে আস্বাদ করবার আকাঙ্ক্ষা মুসলমান সমাজে কোথায়। যারা মুসলমান সমাজে আজকালকার সাহিত্যিক তাঁদের পর্বতপ্রমাণ মূর্খতা দেখে একটুও মনে আশা হয় না যে বাংলার

মুসলমানের চিত্তে কোনো দিন সত্যের সন্ধান, জীবনের আস্বাদ লাভ, এ সব জিনিস জাগবে।' ৩০ অক্টোবর ১৯২৭-এ সে কথা লিখবার পরে ৩১ অক্টোবরে আবার তিনি লিখেছেন :

> ... মুসলমান সাধারণত "অহিংসা"র অর্থ বোঝে না। হজরতের জীবনে অস্ত্রধারণ আছে, তাই সেই অস্ত্রের চাকচিক্যই তাদের চোখে লাগে, তাঁর অন্তরে প্রেম যে হাতের অস্ত্রের চাইতে অনেক বেশী প্রবল হয়ে আছে সে দিকে তাদের দৃষ্টি পড়ে না। হিংসা জীবধর্ম তাই মানবধর্মও সন্দেহ নাই, কিন্তু অহিংসা বিশেষরূপে মানবধর্ম। অহিংসা অর্থাৎ প্রেম— এ অন্তরে না জাগলে জীবনের পুরো আস্বাদই ত পাওয়া গেল না। ধর্মজীবনের সূচনাই ত প্রেমের আবির্ভাবে। — এ কথা মুসলমানকে বোঝাতে হবে। কোরআন ও মোহাম্মদের উপর অস্ত্র ও ধর্মের আবরণ পড়ে রয়েছে, তাকে ছিঁড়ে না ফেললে কোরআন ও মোহাম্মদের সত্যকার রূপ উপলব্ধি করা যাবে না। (পৃ.৩২১)

এ-সব কথা যখন ওদুদ তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখছেন, সে সময়ে লেখা হয়েছে তাঁর *নবপর্যায়ের* প্রবন্ধসমূহ। বলা বাহুল্য, এ সময় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র তৎপরতাও শুরু হয়ে গেছে। এ-সমাজের অপর লেখক মোতাহের হোসেন চৌধুরী লেখেন :

> অন্তরের অন্তস্থল হতে উৎসারিত প্রেম আর সমস্ত বিশ্বব্যাপী অখণ্ড অদ্বৈতের অনুভূতিই ধর্ম। এই বৃহৎ ধর্মাদর্শটি সামনে রেখেই যেন আমরা সংসার পথে চলি। তা হলেই আমাদের সমাজের সমস্ত কদর্যতা অপসৃত হবে, আর তার স্থানে ফুটে উঠবে এমন এক ঐশ্বর্য্যময়ী শ্রী, রকমারিত্ব আর শালীনতায় যা অপূর্ব।[৮]

দেখা যায়, বাঙালি মুসলমান সমাজে এঁরা যে ধর্মবোধের চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছেন তা একই সূত্রে বাঁধা; আর তা হচ্ছে প্রেমপূর্ণ ধর্মভাব, মানবতাবোধে উজ্জীবিত ধর্মভাব। মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী জানিয়েছেন, নীতির দিক থেকে ওদুদের মধ্যে যে নতুনত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে তা হল তাঁর সামাজিক চেতনা; জীবনের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা এ সময়ে তাঁর মধ্যে অধিক পরিমাণে পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। আধ্যাত্মিক চেতনার পরিচয় রয়েছে তাঁর ধর্মোপলব্ধির মধ্যে। ধর্ম বলতে তিনি প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান ভরা সাধারণ মানুষের হৃদয়াবেগের অন্ধতাকে গ্রহণ করেন নি; ধর্মপালন অর্থে তিনি বুঝেছেন মনুষ্যত্ব-সাধনা এবং তা-ই পরিপূর্ণরূপে করতে গিয়ে তিনি প্রয়োজনবোধ করেছেন বুদ্ধির মুক্তির। এতদুভয়ের সমন্বয়েই গড়ে ওঠেছে তাঁর ধর্মবোধ। *নবপর্য্যায়ের* প্রবন্ধাদি রচনার মূলে রয়েছে তাঁর এই নবলব্ধ সামাজিক ও আধাত্মিক চেতনা।[৯] ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬-এর ডায়েরিতে ওদুদ লিখছেন :

> জাতি ও ধর্মের সমস্ত গণ্ডী অতিক্রম করে মানুষ বুঝতে পারে— আদিম মনুষ্যপ্রকৃতির দিক দিয়ে তারা কত সমধর্মী। — সেই প্রশস্ত ও দৃঢ় ভিত্তির উপরে মিলন-সৌধ নির্মিত হতে পারে।
>
> মিলনের আর একটি প্রশস্ততর ও অটলতর ক্ষেত্র আছে— ঈশ্বরানুভূতির ক্ষেত্র। তাঁর নয়নজ্যোতিঃসম্পাতে তাঁর বিপুল সৃষ্টি প্রসন্ন রয়েছে, বর্ধিত হচ্ছে, এ বোধের সঞ্চার হলে মিলনের পরিপন্থী সমস্ত অসূয়া ও ঈর্ষা প্রশমিত হয়ে আসে, ফুলের বর্ণ ও সৌরভের মতো মানুষে মানুষে মিলন স্বাভাবিক হয়ে পড়ে।[১০]

এ-ই যখন মনের অবস্থা, সে সময়ে রচিত হয়েছে *নবপর্যায়ের* প্রবন্ধসমূহ। এমনকি উপরোল্লিখিত মিলনসমস্যা বিষয়ক "ডায়রীর এক পৃষ্ঠা" ওদুদ *নবপর্যায়* দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন। নবপর্যায় দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৩৬ সালে বের হলেও এর রচনাকাল ১৩৩১ থেকে ১৩৩৫। অপর দিকে *নবপর্যায়* প্রথম খণ্ডের রচনাকাল ১৩৩১ থেকে ১৩৩৩; এর প্রকাশকালও ১৩৩৩। স্মর্তব্য, ১৩৩১ সালে অর্থাৎ ১৯২৪-এর ২৮ ডিসেম্বরে ওদুদ ডায়েরিতে প্রশ্ন রাখেন :

> Muslim Renaissance in Bengal কি ধরনের হবে?। (পৃ. ৩০৬)

নবপর্যায়ের প্রবন্ধসমূহের আলোচনায় প্রবেশের প্রাক্কালে উক্ত প্রশ্ন আমাদেরও স্মরণে থাকা ভাল।

২

নবপর্যায় প্রথম খণ্ড সম্পর্কে প্রবাসী যে মন্তব্য করেছিল 'বাঙলার মুসলমান সমাজকে উদ্বোধিত' করবার 'উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধের' সম্ভার বলে, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।[১১] এই খণ্ডের প্রথম প্রবন্ধ "মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা"; উল্লেখ্য যে, প্রবন্ধটি সে সময়ে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'তে ও ঢাকার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পঠিত হয় এবং সমসাময়িক তরুণ মুসলমান সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে।[১২] প্রবন্ধটিতে নব-জাগরণকামী বাংলার মুসলমান সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা রয়েছে। ওদুদ বলেন :

> নব জাগরণ-কামী তুর্কী জাতির সমাজজীবনে যে-রূপ দান করতে তিনি (কামাল) প্রয়াসী হয়েছেন, নবজাগরণকামী ভারত বা বাংলার মুসলমান তাঁর সমাজ জীবনে হয়তো হুবহু সেই-রূপেই প্রতিষ্ঠা করবেন না, ভিন্ন পরিবেষ্টন এখানে কার্যকর হবে, কিন্তু কামালের কাছ থেকে এই-ই আমাদের প্রধান

গ্রহণের বিষয় যে, অতীতের অন্ধ অনুবর্তিতায় নব সৃষ্টি সম্ভবপর নয়। নব জাগরণ যিনি চান, অতীতকে কিছু রূপান্তরিত করে না নিয়ে তাঁর উপায় নেই। (পৃ. ১১)

এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য, ১৯২৩ সালে তুর্কিবীর মুস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে 'তুরস্ক প্রজাতন্ত্র' ঘোষিত হয়; এবং তাঁর জাতীয়তাবাদী স্লোগান তুর্কি জনসাধারণের মূলনীতি হয়ে দাঁড়ায়; তুরস্কের জনসাধারণ আধুনিক অর্থে একটি জাতিতে পরিণত হয়; পরের বছর মুসলমানদের সুপ্রাচীন ধর্মীয় রাজনৈতিক খেলাফতের বিলোপ সাধন করে খলিফাকে নির্বাসিত করা হয়, এবং ধর্মের পরিবর্তে ইউরোপের আদলে ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তা-চেতনা সম্প্রসারিত করা হয়।[১৩] ওদুদের দৃষ্টিতে, এর ফলে তুর্কিবীর কামাল পাশা "আধুনিক কালের মুসলমান সমাজের নবীন-পন্থীদের একজন বড় নেতা' হিসেবে সেই রূপান্তরের কাজটিই করেছিলেন, 'সেখানে প্রাচীন শাস্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্বে'র পরিবর্তে 'মানববুদ্ধির অধীশ্বরত্ব'ই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন মানুষের যে জাগতিক জীবন, তা 'যদি সুন্দর না হয়, সুব্যবস্থিত না হয়, তবে সত্যকার নৈতিক জীবন, আধ্যাত্মিক জীবন, তার পক্ষে সুদূরপরাহতই হয়ে থাকে।' কামাল 'এই সুন্দর জাগতিক জীবনের তত্ত্ব নতুন করে উপলব্ধি'ই শুধু করেন নি, 'সে উপলব্ধিকে নানা প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলে এর অমৃত-রস' তাঁর স্বদেশীয়দের অন্তরে পৌঁছে দিয়ে গেছেন।[১৪] তুর্কিজাতির পুনর্গঠনকে তিনি তাঁর সাধনার বিষয় করে নিয়েছিলেন। 'স্বাধীনতায়, ধনে, মানে, জ্ঞানে, সুরুচিতে, মনুষ্যত্বে তুর্কীজাতি যাতে সত্যকার মনুষ্যজাতি হয়ে গড়ে উঠতে পারে— শক্তিমান মানুষের প্রাণ আর মস্তিষ্ক নিয়ে নিজেদের প্রাচীন ধর্মাদর্শের, ও অন্যান্য জাতি ও সভ্যতার আদর্শের মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারে' এই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর আপ্রাণ চেষ্টার বিষয়।[১৫] তাই বলে তিনি ইউরোপের অন্ধ অনুকারক ছিলেন না। ওদুদ বলেন, 'কামাল মুসলমান সমাজের নবজীবনারম্ভের এক চমৎকার পূর্বসূচনা, সভ্যজগতে হতশ্রী মুসলমানের জন্য বিধাতার হাতের এক স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর কর্ম- ধারায়'।[১৬]

বলা বাহুল্য, বিশ শতকের প্রথম দিকে, মুসলমান জগত, বিশেষত ভারত তথা বাংলার মুসলমান যখন খেলাফতের ঘোরে বিভোর ও আত্মরক্ষায় হতাশ এবং সমাজনেতৃবৃন্দের মূঢ়তায় দিশেহারা, ঠিক সে-সময় মুসলমানের নেতা হিসেবে তুরস্কে শৌর্যে-বীর্যে উত্থিত হলেন মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১-১৯৩৮)। তিনি একদিকে যেমন মুসলিম বীর রূপে প্রজ্জ্বলিত হলেন, অপরদিকে খেলাফত-ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটিয়ে মুসলমানের প্রথাগত জীবনে যুগোপযোগী পরিবর্তন এনে নব্য তুরস্ক বিনির্মাণে ব্রতী হলেন, এক কথায় তুরস্কে নবজাগরণের সূচনা করলেন। প্রথাগত

বাঙালি মুসলমান সমাজে তাঁর "ছোট-খাটো 'অনৈস্‌লামিকতা'র"[১৭] ধৈর্য-পরীক্ষা শুরু হলেও, এ সমাজের প্রগতিশীল তরুণ লেখকরা কামালের আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে নবজাগরণের স্বপ্ন দেখলেন। তরুণ নজরুল *ধূমকেতু* পত্রিকায় লিখলেন "কামাল" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং মোসলেম ভারত পত্রিকায় "কামাল পাশা" শীর্ষক কবিতা, গোলাম মোস্তফা লিখলেন "মোস্তফা কামাল", "বিজয়-উল্লাস" প্রভৃতি কবিতা; বেনজীর আহমদ লিখলেন "বিপ্লব-সাধনায় কামাল' শীর্ষক প্রবন্ধ।[১৮] এবং অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ লিখলেন *কামাল পাশা* নাটক। ওদুদ ১৩৩২-এ লিখলেন এ প্রবন্ধ; এর আগে ১৯২৪-এর ৭ই মার্চের ডায়েরিতে তিনি লেখেন :

> খেলাফত বিধ্বংস হল। ...বর্তমান জগতের দিকে তাকিয়ে মনে হয় এই যে খেলাফত ধ্বংস হল এই-ই সব চাইতে দরকারি।...বর্তমান জগতের জ্ঞান বিজ্ঞান সমস্ত শক্তি আত্মস্থ্ করে যে বাঁচা সেই বাঁচাই সবার পক্ষে সত্য বাঁচা, মুসলমান শুধু গায়ের জোরে বাঁচতে চেয়েছে। খেলাফত ধ্বংস হওয়াতে সেই গায়ের জোরের অবকাশ থাকবে না। এইবার জ্ঞানবিজ্ঞানের জোরের বেশি প্রয়োজন হবে। তা ছাড়া এই খেলাফত ধ্বংসে সব চাইতে বড় লাভ— ধর্মের অনুশাসন মুসলমান যে-ভাবে শাসিয়ে আসছে আত্মার জন্য তা নিছক অমঙ্গলকর। বিধি-বিধান মানা ধর্ম নয়— ধর্মভাবের জাগরণই প্রকৃত ধর্ম— অর্থাৎ প্রেম স্বার্থহীনতা এসব — অথবা নিজেকে জগতের সঙ্গে যুক্ত জ্ঞান করাই ধর্মের প্রথম সোপান (ভূমার স্থান)। সেই যে জ্ঞানচর্চার ভেতর দিয়ে ধর্মজীবন যাপন খেলাফত ধ্বংসে মুসলমানদের সে অবসর আসবে। ধর্মের এখনকার অর্থ দাঁড়াবে— কতকগুলো ভাল কথা, প্রয়োজন আজকার তাও। ধর্মের নির্দেশগুলোকে জীবনের উপর অর্থাৎ তোমার বুদ্ধি-বিচারকে অভিভূত করে–প্রভুত্ব করতে দিও না।...
>
> এতকাল মানুষের যে অবস্থা গেছে তাতে ধর্মের শক্ত খোসা তার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু এখন পরিষ্কার দেখছি মানুষ সে খোসার ভেতর থেকে বেরিয়ে মুক্ত আকাশ বাতাসের ভেতরে জন্মলাভ করছে— মুসলমান জগতেও এই ধর্মের খোসা ভাঙতে বাধ্য। কামাল ধন্য— তিনি অন্তত একটা বড় কাজে পথ দেখিয়েছেন। বহিঃশত্রু বিজয়ের চাইতেও মহত্তর তাঁর এই অন্তঃশত্রু বিজয়। ভারতের মুসলমানদেরই এতে সব চাইতে বেশি উপকার হবে ...এই ডিমোক্র্যাসির দিনে সাম্রাজ্যের অর্থ নাই— খেলাফত সেই সাম্রাজ্য। (পৃ. ২৯৮-৯৯)

"মুস্তফা কামাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধেও ওদুদ 'আধুনিক মুসলমানের জন্য অতি অপ্রয়োজনীয় এবং রাজনীতির দিক দিয়ে অতি অনিষ্টকর এই খেলাফত-জ াল সবলে দূর' করার জন্য কামালের প্রশংসা করেন। প্যান-ইসলামিজমের

সমালোচনায় তিনি বলেন, 'প্রকৃত প্রস্তাবে এই প্যান-ইসলামের তথাকথিত সঙ্ঘবদ্ধতা কি মুসলমানের দুর্বলতাকেই লালন করে চলে নি? ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাদের সত্যকার অবস্থা কি, কি উপায় অবলম্বন করলে পুনরায় তারা শক্তিমান হয়ে সম্মানিত জীবনযাপন করতে পারবে, এ সবের দিকে এই সঙ্ঘবদ্ধতা তাদের দৃষ্টিকে কি অন্ধ করেই রাখে নি?'[১৯] অপর দিকে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের সমালোচনায় বলেছেন, "বর্তমান কালে দুর্ভাগ্য বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের যে বিশ্বাসবানরা ধ্রুব নিশ্চয় করে বসে আছেন, মুসলমানের চরম কৃতিত্ব, হজরত তাঁর জামায় কি ধরনের বোতাম ব্যবহার করতেন, আর তাঁর আস্‌হাবরা কি ধরনের খাদ্য চর্বণ করতেন, সেই সমস্ত তত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ উদ্ধারে'।[২০] তাদের বাদ দিয়ে ওদুদ এ-সমাজের শিক্ষিত জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীদের উদ্দেশে বলেন, এঁরা 'নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, অন্যান্য জাতির বা দেশের ইতিহাসের মতো ইসলামের ইতিহাসও শুধু একই আদর্শের অপ্রতিহত প্রবাহ নয়। বিভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সে ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ না গ্রহণ করে পারে নাই।'[২১] যুগবৈচিত্র্য অনুযায়ী ইসলামের ইতিহাসের বিচিত্র রূপের বাস্তবতার সাক্ষ্য-প্রমাণ তুলে ধরে ওদুদ ভারত তথা বাংলার মুসলমান সমাজে নব সৃষ্টির উন্মাদনা আনয়নে প্রয়াসী হতে উৎসাহ যোগান। এবং তার অনুকূলে মুস্তফা কামালকে নেতা রূপে স্বাগত জানান। তাঁর মতে, সত্যের আঘাত প্রচণ্ড। মুসলমানের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গতানুগতিকতাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে, নব সৃষ্টির প্রয়োজন ও সম্ভাবনা দেখিয়ে, মুসলমান-সমাজের বুকে কামাল যে সত্যকার আঘাত দিয়েছেন, আশা করা যায়, এই আঘাতেই আমাদের এই শতাব্দীর মোহ-নিদ্রার অবসান হবে। ধর্মে, কর্মে, জাতীয়তায়, সাহিত্যে, সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের ভিতরে স্থান পেয়েছে যে জড়তা, দৃষ্টিহীনতা, মনে আশা জাগছে, যেমন করেই হোক, এইবার তার অবসান আসন্ন হয়ে এসেছে। কামালের প্রদত্ত এই আঘাতের বেদনাতেই হয়তো আমরা উপলব্ধি করতে পারবো— সত্যকার ধর্মজীবন কি, জীবনের সঙ্গে শাস্ত্রের সত্যকার সম্বন্ধ কি। হয়তো আরো উপলব্ধি করতে পারবো, জীবন-সমস্যার চরম সমাধান কোনো কালেই হয়ে যায় নি; নতুন করে সে সমস্ত বিষয়ে সচেতন হওয়া আর তার মীমাংসা করতে চেষ্টা করা— এই-ই জীবন। (পৃ. ১২)

নানা সংস্কারে জর্জরিত হীন-ক্ষীণ তামসিক জীবনের পরিবর্তে ওদুদও তূর্কি বীর কামালের মতো বাঙালি মুসলমানের জন্য কামনা করেন সর্বপ্রকার সমৃদ্ধ সুন্দর সবল জাগতিক জীবন, যে জীবনের ওপর প্রাচীন শাস্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্বের পরিবর্তে 'মানববুদ্ধির অধীশ্বরত্ব' প্রতিষ্ঠিত। ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও বাঙালি হিন্দুর

নবজাগরণের শিক্ষা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েও বাঙালি মুসলমান এ-চৈতন্য লাভ করতে পারে বলে তাঁর অভিমত। আর এটি ঘটলেই তারা বুঝতে পারবে প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে নবপর্যায়ের জীবনের পার্থক্য।

৩

দ্বিতীয় প্রবন্ধ "সাহিত্যে সমস্যা"য় ওদুদ বলেন, প্রতিভাবানদের সৃষ্টির উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারটি বড় বিস্ময়কর। তাই বাংলার নব জাগরণের পথিকৃৎ রামমোহনের দেশ বঙ্গের এক প্রান্ত এবং কাল উনিশ শতকের প্রথম ভাগ হলেও, সেই বৈদিক যুগ ঔপনিষদ্ যুগ আর মোতাজেলাদের যুগও তাঁর কাছে সমান জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে।[২২] তাঁর মতে, প্রতিভাবানের হাতে প্রলয়ের যে ঘটা তার স্তরে স্তরে মঙ্গল বিরাজমান; তাই সীতা-সাবিত্রীর বা একালের সূর্যমুখীর আসনে আজ যদি উপবিষ্ট দেখি দামিনীকে, রাজলক্ষ্মীকে, তার জন্য অস্বস্তি-আফ্‌সোসের কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, কেন না এ সমস্ত এক নবপর্যায়ের মঙ্গলমূর্তি— নব নব পথে প্রবহমান জীবনের নব নব আবিষ্কার।'[২৩]

অপরদিকে বিপুল প্রতিভার অধিকারী মহামানবের আবির্ভাব তাঁর কালের লোকদের কাছে দুর্জ্ঞেয় ও অপ্রত্যাশিত হতে পারে; তাই দেখা যায়, 'যে অমিত-তেজসম্পন্ন একেশ্বরবাদ আর নৈতিক জীবনের আদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হলেন মোহাম্মদ সাধারণ আরবীর পক্ষে তা এতই অবাঞ্ছিত যে ব্যক্তিগতভাবে অকথ্য অত্যাচার সারাজীবন তাঁকে তো সহ্য করতে হয়েছেই, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর জ্ঞাতি কোরেশকুলের অধিকাংশ ব্যক্তি বহুদিন পর্যন্ত সে-তত্ত্ব বুঝেই উঠতে পারে নি।'[৩৪] সবশেষে এ-প্রবন্ধে ওদুদ বলেন, 'বাস্তবিক বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট হয়ে যায় নি, অতীত সংস্কারের জুজুর ভয়ে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস যেখানে ক্ষীণ কাহিল হয়ে পড়ে নি, সমস্যা নিয়ে কোনো সমস্যাই সেখানে নেই।'[২৫] অতএব, বাঙালি মুসলমানের বুদ্ধি যদি আড়ষ্ট না হয়, অতীত সংস্কারের ভয়ে তাঁরা যদি আত্মশক্তিতে বিশ্বাস না হারান, তবে তাঁদের সমস্যা নিয়েও কোনো সমস্যা থাকবে না।

৪

পরের প্রবন্ধ "মানব-মুকুট" মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর *মানব-মুকুট* বইয়ের সমালোচনা। বলা বাহুল্য, এটি ছিল একটি চটি বই, অর্থাৎ পরবর্তীতে এয়াকুব আলী চৌধুরী হজরত মোহাম্মদের (স) জীবন সম্পর্কিত সাতটি প্রবন্ধের সমন্বয়ে যে *মানব-মুকুট*[২৬] গ্রন্থ বের করেন, তার প্রথম পর্যায়ের চটি সংস্করণ। ওদুদের ভাষায় :

> কাজেই এটি হযরত মোহাম্মদের পুরোপুরি জীবনী নয়— জীবনী-পাঠ, অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার আলোচনা কিন্তু এই অল্প পরিসরে ষষ্ঠ শতাব্দীর সেই মহাপুরুষ সম্বন্ধে এমন অনেক কথা তাঁর কলমের মুখে বেরিয়েছে যা বাংলার মুসলিম সমাজের কাছে এক অতি বড় সুসংবাদ— অন্ততঃ মুসলমানের নব জাগরণের প্রতীক্ষায় যাঁরা বসে আছেন তাঁদের চোখে এ এক চৎকার পূর্ব সূচনা।[২৭]

বিশেষত গ্রন্থকারের 'অন্তঃকরণের জীবন্ত স্পর্শের জন্যই' মানব-মুকুট ওদুদের কাছে এত গুরুত্ববহ মনে হয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে, এখানে 'একজন জীবন্ত আধুনিক যুগের পুরুষ পাঠ করতে চেষ্টা করেছেন হজরত মোহম্মদের মহাজীবন' — যাতে নির্জীব ও পিছুগামী বাঙালি মুসলমানের জীবনে সাড়া জাগাবার উপাদান রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ওদুদ 'জীবন্ত' ও 'আধুনিক' শব্দদ্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তাঁর মতে, 'যে জীবন্ত সে আধুনিক বা যুগধর্মী'। বাঙালি মুসলমানের জীবনে নব জাগরণ আনতে এ-দুইয়েরেই প্রভাব অপরিহার্য। ওদুদ *মানব-মুকুটে* এ দুইই-লক্ষ করে আশান্বিত হয়েছেন। বিশেষ করে যে মহাপ্রাণতা নিয়ে লেখক এতে হজরতের জীবনী-পাঠের আয়োজন করেছেন তা ওদুদকে আশান্বিত করেছে, এ জন্য যে, তিনিও 'বাংলার মুসলিম চিন্তা-জগতে এক অনুপম সূচনা' কামনা করেন অর্থাৎ এ-সমাজের নব জাগরণই তাঁর কাম্য। এয়াকুব আলী চৌধুরীর প্রয়াসকে কেন্দ্র করে ওদুদ মনে করেন, 'মহাপ্রাণতার সামান্য স্পন্দনও বাঙালী মুসলমানের বুকে জেগেছে' এর চেয়ে সুখকর সংবাদ আর কি হতে পারে।[২৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওদুদের নিজ জেলার অধিবাসী এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে খ্যাত হলেও তাঁর লেখা 'সুষ্ঠু মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনায়' উজ্জ্বল; 'মানব-মুকুটে' 'তিনি হজরত মুহাম্মদকে (স) দেখেছেন কেবল ইসলামের নবী হিসেবে নয়, নিখিল মানবজাতির সেবক ও পথপ্রদর্শকরূপে। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন :

> এই মানবতার যুগে সাম্প্রদায়িতকতার সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষরূপে বিশ্বমানবের নিকটে ইহা অসঙ্কোচে বলিবার সময় আসিয়াছে যে, হজরত মোহাম্মদ মানবতার যে মহিমা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা শুধু অসামান্য নহে, অতুলনীয়, মুহূর্তের মৃত্যু দ্বারা নহে, পরন্তু বর্ষব্যাপী জীবন দ্বারা মানুষের জন্য আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা চিরকালের জন্য মানুষের সুমহান আদর্শরূপে উজ্জ্বল হইয়া আছে। পৃ. ৫

হযরত মুহম্মদের (স) প্রতি তিনি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার জন্য নয়, তাঁর মধ্যে মানবজীবনের যে বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছিল তারই জন্যে, হজরতকে তিনি দেখেছেন এক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মর্ত্যপ্রেমিক মানবরূপে।[২৯] এ প্রসঙ্গে ওদুদ বলেন :

> "আনা বশারুম মেস্লোকুম" আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ, হযরত মোহাম্মদ সম্পর্কে কোরআনের এই বাণীই তাঁর সমস্ত চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্র। সর্বপ্রকারে এই আরবের মহাপুরুষ যে মানুষ, — সব অলৌকিকতা, সব অবতারত্ব, সব অমানুষিক কৃচ্ছ্রসাধনা, এ সমস্তের পরিবর্তে তাঁর সমস্ত ব্যাপার যে সাধারণ মানুষের জীবনের মতোই স্বাভাবিক, কত যত্ন কত দক্ষতার সঙ্গে লেখক এই সমস্ত কথা বার বার তাঁর গ্রন্থের মধ্যে বলেছেন। আরবের এই মহাপুরুষ যে হাড়ে হাড়ে মানুষ— দুঃখ কষ্ট সহন ব্যাপারে তিনি মানুষ, উন্মাদিনী শক্তির আকস্মিক আবির্ভাবে নয় কিন্তু সাধনার পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতিতে তিনি মানুষ, সিদ্ধিলাভের প্রাক্কালে মানব সুলভ ভয়-বিহ্বলতার জন্য তিনি মানুষ, সিদ্ধ পয়গম্বর অবস্থায় পরম করুণ-প্রাণতার জন্য তিনি মানুষ, মানুষের নিকটতম আপনার জন, — এই সমস্ত কথা কত আনন্দে কত আবেগে লেখকের লেখনীমুখে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। (পৃ. ২৭-২৮)

এ-ভাবে এয়াকুব আলী চৌধুরীর রচনার মধ্যে প্রাচীন সত্যের যে নব আবিষ্কারের প্রয়াস ওদুদ লক্ষ করেছেন, তা আধুনিক জীবনের জন্য অতীব প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। আধুনিক জগতের যে জীবন-সমস্যা তা হজরতের জীবনাদর্শে সামাধান-যোগ্য কি না, সে প্রশ্নও *মানব-মুকুটে* বিধৃত হয়েছে। ওদুদ বলেন, 'মানব-মুকুটে'র গ্রন্থকার একজন জীবন্ত ব্যক্তি বলেই যুগ-ধর্মের প্রভাব তাঁর ভিতরে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে।'[৩০] *মানব-মুকুটে* লেখক বলেছেন :

> গৃহহীন খৃষ্ট ও বুদ্ধের প্রেম ও ত্যাগ আমাদিগের মনকে এতকাল মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে যে, কে সেই মহাপুরুষ যিনি মানবের চিরকালের আবাস-ভূমি গৃহাঙ্গনকে তুচ্ছ না করিয়া পবিত্র ও মধুর করিয়াছেন; মানুষের বিচিত্র সুখ দুঃখ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাময় মরজীবনকে জীবন দ্বারা সার্থক ও সুন্দর করিয়া অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়াছেন... ।[৩১]

নিশ্চয়ই তিনি 'হজরত মোহম্মদ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ'। এয়াকুব আলীর এ মতের অপর পিঠে ওদুদ বলেছেন, 'ভক্তের কাছে তাঁর প্রিয় আদর্শ নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠতম, কিন্তু এমন কোনো যুক্তি-তর্ক আছে কি না যার সাহায্যে কোনো মহাপুরুষকেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে প্রতিপন্ন করা যায়, তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়।'[৩২]

কেননা, 'অতি বড় যে ব্যক্তি তাঁর জীবন যেমন কালের শাসনের বাইরে নয়, তাঁর চিন্তা-ভাবনা মত-বিশ্বাসও তেমনি কালের শাসনের বাইরে নয়।'[৩৩] এ দিক থেকে 'মানব-মুকুটে'র অসম্পূর্ণতা ওদুদের চোখে পড়ে, তবে তার চেয়ে অনেক বেশি চোখে পড়ে 'এর লেখকের বলীয়ান হৃদয়— নব সাধনায় যা তাজা আর রঙীন'। বাঙালি মুসলমানের জন্য এ হৃদয়ই অধিক প্রয়োজন বলে ওদুদ মনে করেন। তাই, তাঁর মতে, সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এক নব-জাগরণ পূর্ব-লক্ষণ স্ফূরিত হচ্ছে গ্রন্থটির পাতায় পাতায়।[৩৪] বাঙালি মুসলমানের জন্য এ শুভ সংবাদ।

এ-প্রবন্ধে ওদুদ বাঙালি মুসলমান সমাজ সর্ম্পকে আরো কিছু আশাবাদের কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন (১) মানব-মুকুট পড়ে তাঁর আশা জেগেছে, 'এই অবজ্ঞাত বাংলার মুসলমানও হয়ত শুধু খেয়ে পরে বংশ-বৃদ্ধি করে ধ্বংস হয়ে যাবে না।'[৩৫] তার চৈতন্যের সঞ্চার হয়েছে। (২) সে-কালের মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙালি মুসলমান-সমাজে যুগান্তর আনয়নের প্রচেষ্টায় সমাজ-অভ্যন্তরে সমস্যা নিয়ে ভাবছেন, এঁরা হলেন মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ও মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী।[৩৬] (৩) 'বাংলা বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা হলেও এত কালের বাংলা সাহিত্যে তার বিশেষ কোন দাবি দাওয়া' ছিল না,[৩৭] এয়াকুব আলী চৌধুরীর রচনা পড়ে ওদুদ সে-দাবির সময় হয়েছে বলে ভাবছেন।

৫

পরবর্তী রচনা "পণ্ডিত সাহেব" (১৯২৫) মুন্সীগঞ্জ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই সম্মেলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি। বন্ধুদের সঙ্গে সে সাহিত্যসম্মেলনে যোগ দিয়ে ওদুদ সত্যান্বেষী যে গ্রাম্য পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলেন, তাঁকে নিয়ে লিখেছেন এ-লেখা। 'এই সবল মেরুদণ্ড-সম্পন্ন আত্মাভিমানী গ্রাম্য পণ্ডিতের প্রতি এক আন্তরিক স্নেহ আর সহানুভূতিতে' তাঁর হৃদয় ভরে উঠেছিল।[৩৮]

'সর্বপ্রকারে অধঃপতিত বাংলার বিশাল মুসলমান সমাজের পুঞ্জীভূত প্রাণহীনতার মাঝে হেথায় হোথায় কচিৎ কখনো সত্যকার প্রাণস্পন্দনও যে অনুভব করা যায়'[৩৯] তার প্রমাণ এই "পণ্ডিত সাহেব"। পণ্ডিত সাহেব পনেরো বছর ধরে গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক; বহুকাল গ্রামের 'খতিব'ও ছিলেন; কোনো রকমে দিনাতিপাত করছেন— 'বাংলার মুসলমানদের হাজার-করা নয় শত নিরানব্বই জনের যে রকমে

হয়।'[৪০] কিন্তু তাঁর মধ্যে রয়েছে সত্যান্বেষীর বিজ্ঞান-দৃষ্টি। তাঁর স্কুলের ছাত্ররা প্রায়ই বৃত্তি পায়, স্কুল পরিদর্শক তাঁর প্রশংসা করেন। কিন্তু গ্রামের দুষ্ট লোকদের এ-সব সহ্য হয় না। 'এরা লোক দেখিয়ে নামাজ পড়ে; পরের অনিষ্ট আর নিজের স্বার্থসিদ্ধির দিকেই এদের মন; এরা নামেমাত্র মুসলমান, কাজে একদম পশু'।[৪১] পণ্ডিত সাহেবের ভাল প্রয়াসগুলোকে এরা ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চায়। তবু তিনি আত্মশক্তিতে ভর করে টিকে থাকার চেষ্টা করেন; গ্রামের মাতব্বরের কথামত মিথ্যা সাক্ষ্য দেন না, মাতব্বরের ছেলের অন্যায়-বিয়েতে সহযোগিতা করেন না। নিরন্তর তিনি তাঁর পারিপার্শ্বিক হীনতার সঙ্গে লড়াই করে চলেন। ওদুদ অধঃপতিত বাঙালি মুসলমান সমাজে এই ধরনের লোকদেরকে আশার আলো হিসেবে দেখতে পান। সমাজে অবহেলিত হলেও এঁরাই মূলত বাঙালি মুসলমান সমাজে আশার স্থল। যদিও এরাঁ সে সমাজে অগ্রবর্তী বলে অবহেলিত। কেননা,

> যাঁরা অগ্রবর্তী চিরকালই তাঁদের কষ্ট ভোগ করতে হয়। পেস্টালোট্‌সি যখন তাঁর নব-উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে শিশুর শিক্ষা বিধানে অগ্রসর হলেন, অভিভাবকরা তাঁর কাছে সন্তান পাঠাতে পর্যন্ত রাজি হলেন না। রাস্তার বেওয়ারিশ ছেলেদের নিয়ে প্রথমে তাঁর নূতন ধরনের শিক্ষা চললো।' (পৃ. ৪৫)

৬

কাজী ইমদাদুল হক মৃত্যুবরণ করেন ১৯২৬ সালে; সে বছর এপ্রিল মাসে ওদুদ লেখেন 'কাজি ইমদাদুল হক স্মরণে প্রবন্ধটি"। এটি তিনি ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র শোক-অধিবেশনে পড়েছিলেন। প্রবন্ধটিতে ওদুদ সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হকের বিস্তৃত আলোচনার পরিবর্তে তাঁর জীবনোপভোগের মূল্যবান পরিচয়টি তুলে ধরে বাঙালি মুসলমান সমাজে সে-আদর্শ জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিশেষত নিরানন্দ বাঙালি মুসলমান সমাজে কাজী ইমদাদুল হক যে স্বাধীনচিত্ততায় সৌন্দর্যমণ্ডিত জীবন অতিবাহিত করে গেছেন, তা অফুরন্ত জীবনানন্দের আদর্শ রূপে ওদুদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে। তিনি বাঙালি মুসলমানের জীবনে সেই জীবন-স্ফূর্তির বন্যা দেখতে চান। তাই বলেন :

> সুন্দর অথচ স্বল্পজীবী কাজি ইমদাদুল হক্ নানা দিক দিয়েই বাঙালী মুসলমানের চিত্তোৎকর্ষের সৌধের জন্য মূল্যবান উপকরণরূপে নিজেকে উপস্থাপিত করেছেন। জড়তায় ক্লিষ্ট, তামসিকতায় সমাচ্ছন্ন, বাঙালী মুসলমান সমাজের কোলে প্রথম যৌবন থেকে এই তেতাল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সুন্দর অথচ ক্ষীণ দীপশিখার মতো তিনি

> স্বাধীন-চিত্ততা নিয়ে জ্বলেছেন; নিজের পারিবারিক জীবন ঘিরে সরসতার ব্রততী লতিয়ে তুলে মুসলমানের উষর চিত্তক্ষেত্র পল্লবিত করার অব্যর্থ ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। (পৃ. ৫৫)

তা চির স্মরণের যোগ্য বলে ওদুদ মনে করেন। ১৮৮২ থেকে ১৯২৬, এই 'অল্প পরিসরে নিরলসতা, ভব্যতা, উদ্ভাবনা, আর আনন্দ নিয়ে তাঁর সমগ্র জীবন এক সুন্দর সৃষ্টির ছন্দের আত্মপ্রকাশ করেছিল'[৪২], তাই ইমদাদুল হক বিস্মৃত হবার নন।

ওদুদ জানান, ছেলেবেলা থেকে তিনি কাজী ইমদাদুল হকের কথা শুনে আসছেন, শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজে তিনি নামজাদা ব্যক্তি ছিলেন। ওদুদ তাঁর সাহচর্যে গিয়ে আনন্দোজ্জ্বল জীবনের সন্ধান পান; এমনকি কঠিন অস্ত্রোপচার হবার পর ভগ্ন-স্বাস্থ্য নিয়েও তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা কথার অবতারণা করতে কসুর করতেন না; এবং

> তার অধিকাংশই বাঙালী মুসলমান-সমাজের অদ্ভুত রীতি-নীতি বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পর্কে। কিন্তু ঠিক সংস্কারকের মনোভাব তাঁর ছিল না। ছেলেপিলের লালনপালনে আদবের অর্থশূন্য কড়াকড়ি, অবরোধের বিড়ম্বনা, মুসলমান সমাজপতিদের বুদ্ধির স্থূলতা— এই সমস্ত নিয়েই তিনি মৃদু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। মুসলমান সমাজে বজ্রকঠোর গোঁড়ামিকে তিনি সামনা-সামনি আঘাত করতে যান নি, অথবা চান নি; তাঁর পাশ কাটিয়ে নিজের পরিজন ও বন্ধুবান্ধব নিয়ে একটা সুন্দর অথচ ঘাতসহ জীবনের আয়োজন করে যেন সমাজকে বলতে চেয়েছেন— আমি জীবন উপভোগ করছি, তোমরা যদি না পার সে তোমাদের দুর্ভাগ্য। (পৃ. ৫৩-৫৪)

ওদুদের এ-মূল্যায়ন যথার্থ। যদিও তিনি ইমদাদুল হকের *আবদুল্লাহ্, প্রবন্ধমালা, নবীকাহিনী, বোগদাদি গল্প* প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালি মুসলমানের চিত্তবিকাশের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা রেখেছে, সে বিচারের ভার পরবর্তী গবেষকের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে বলা যায়, তাঁর প্রায় সব রচনাতে 'সেকালের মুসলমান লেখকের মতো ঐতিহ্যগর্ব এবং সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্যের প্রভাব তাঁকে স্পর্শ করেছিল। এটা সে যুগের পরিবেশের ফল'[৪৩]; বলা বাহুল্য, সাহিত্যক্ষেত্রে এ মনোবৃত্তি তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর *আবদুল্লাহ্* উপন্যাসে সম্পূর্ণ স্বাধীন চিত্তের ও মৌলিক পর্যবেক্ষণ–শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন; তাই বইটি বাঙালি মুসলমান সমাজের ক্ষয়িষ্ণু আদর্শ ও পরিহার্য রীতিনীতি সমালোচনার এক স্মরণীয় প্রচেষ্টায় পরিণত হয়েছে।[৪৪] এ গ্রন্থের আবদুল্লাহ ও আবদুল কাদের সে সময়ের বাঙালি মুসলমান সমাজে নবীন আদর্শের স্মারক; আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তারা সামাজিক মূঢ়তার পরিবর্তে সামাজিক অগ্রগতিকে বরণ করতে সক্ষম হয়।

৭

নবপর্যায় প্রথম খণ্ডের সর্বশেষ ওদুদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবন্ধ "সম্মোহিত মুসলমান"। তার পূর্ববর্তী প্রবন্ধ "সৃষ্টির কথা" কাব্যময় সৃষ্টিরসে ভরপুর হলেও বাঙালি মুসলমান সমাজ-প্রসঙ্গে তেমন গুরুত্ববহ নয়। যদিও এর কবির সৃষ্টিমুখর আনন্দদীপ্তি এ-সমাজের বুকে জাগলে ওদুদ সে-দিব্যমূর্তির মতো অভিনন্দিত করতেন; যেমনটি কবি 'পরম বেদনা ও আনন্দের দৃষ্টিতে' এর সর্বাঙ্গ অভিনন্দিত করেছিলেন।[৪৫]

"সম্মোহিত মুসলমান" প্রবন্ধটি ১৩৩৩ এর জ্যৈষ্ঠে রচিত এবং সে বছর ভাদ্রে *অভিযান* ১ম বর্ষ-১ম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়; মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রথম বর্ষের পঞ্চম অধিবেশনে (৮.৭.১৯২৬) ওদুদ এটি পড়েছিলেন। সে বছরেই এ-প্রবন্ধ সহকারে *নবপর্য্যায়* গ্রন্থ প্রকাশিত হলে অব্যবহিত পরে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ *মাসিক মোহাম্মদীতে* প্রধানত উক্ত প্রবন্ধকে উদ্দেশ্য করে নবপর্য্যায় না নবপর্য্যয় শীর্ষক পর পর চার সংখ্যা (ফাল্গুন, চৈত্র ১৩৩৪, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫) বিরূপ সমালোচনা বের করেন। মূলত "সম্মোহিত মুসলমান" কে কেন্দ্র করেই এই প্রতিক্রিয়া। *মাসিক মোহাম্মদীর* ফাল্গুন ১৩৩৪ সংখ্যায় মোহাম্মদ আকরম খাঁ লেখেন, "কাজী ছাহেবের ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শ মতে আমরা নবপর্য্যায়ের "সম্মোহিত মুসলমান" প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি— এবং পড়িয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, কাজী ছাহেব নবপর্য্যায়ের নামে বস্তুত এছলামের বিপর্য্যয় সাধন করারই চেষ্টা করিয়াছেন।" আকরম খাঁ প্রবন্ধটির বিকৃত ব্যাখ্যা করে বলেন :

> এই প্রবন্ধে কাজী ছাহেবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, হজরত মোহাম্মদের অনুবর্তীরা ঘোর পৌত্তলিক— কারণ তাহারা মহাপুরুষের প্রেরিতত্বে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ তাহারা মনে করে যে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লার প্রেরিত বা রছুল। তাঁহার মতে হযরতকে আল্লার রছুল বলিয়া বিশ্বাস করা অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিমা পূজা করা, একই কথা। এই প্রতিমা পূজার কল্যাণেই এছলামের "ইতিহাসটা বহুল পরিমাণে ব্যর্থতার ইতিহাসে" পরিণত হইয়াছে, এবং এই জন্যই "আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা ও সাংসারিকতা"র সকল দিকে মুছলমানকে শোচনীয়রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে।[৪৬]

এই ব্যাখ্যা যে বিকৃত ও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তা প্রবন্ধটি ভালভাবে পড়লেই বোঝা যায়। মূলত আকরম খাঁ-রা ওদুদের লেখার মূল spirit -ই বুঝেন নি বা

বুঝতে চান নি, বরং তাঁর লেখার বিক্ষিপ্ত নেতিবাচক অংশের বিভ্রান্তিকর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাঁকে সাধারণ বিশ্বাসী মুসলমানের কাছে চরম ঘৃণ্য ও হেয় প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। এঁদের সম্পর্কে ওদুদ উক্ত প্রবন্ধেই বলে রেখেছেন :

> জগতের জন্য ইসলামের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় নি। বরং ইসলামের যে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণতা, সাম্য ও মৈত্রীর বীর্যবন্ত সাধনা, জগতের জন্য আজো সেই সমস্তেরই দারুণতম প্রয়োজন। কিন্তু এই কল্যাণময় ইসলামকে বহন করে জগতের আর্তক্লিষ্ট নরনারীর সেবায় পৌঁছে দেবে কে? নিশ্চয়ই সেটি সেই কৃপার পাত্রের দ্বারা সম্ভবপর নয় যে "আলেম" বলে নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার যার সাংঘাতিকভাবে বন্ধ। শত শত বৎসরের পুরাতন বিধিনিষেধের তুচ্ছ তালিকা থেকে চোখ উঠিয়ে আল্লাহ্‌র এই জীবন্ত সৃষ্টির অন্তহীন সুখ দু:খ ব্যথার পানে এতটুকু প্রীতি ও সমবেদনার দৃষ্টিতে চাইতে যে অপারগ![৪৭]

মাসিক মোহাম্মদীর পরের সংখ্যায় আকরম খাঁ আরো নগ্নভাবে কাজী আবদুল ওদুদকে উদ্দেশ্য করে লেখেন :

> কাজী ছাহেবকে প্রকাশ্যভাবে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, তিনি কোরআন বা হাদিছের কোনও স্থান হইতে ইহার সামান্য একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া নিজের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। তিনি আলেম সমাজ সম্বন্ধে নীচ আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, নিতান্ত ধৃষ্টের ন্যায় অতীত ও বর্তমানের সমস্ত মুছলমানকে পৌত্তলিক বা মোশরেক বলিয়া বর্ণনা করিতে লজ্জিত হন নাই, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার এবং তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রতি প্রকারতঃ বা প্রকাশ্যতঃ খৃষ্টান, আর্য সমাজ এমন কি আবু জেহেল ও আবু লাহাব অপেক্ষাও নিকৃষ্টতম আক্রমণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, কিন্তু তাহার যত দ্বিধা যত কুণ্ঠা, নিজের উক্তির প্রমাণ দিবার সময়। এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া যাহারা সূক্ষ্ম বিচারের ভান ও দার্শনিকতার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বাস্তবিক দয়ার পাত্র– তাঁহারাই। ...মানুষরূপে হজরতের সাধনাকে চরম অপমানে অপমানিত করার যুক্তিবাদের মধ্যে কি অভিনব দার্শনিকতা নিহিত আছে, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কাজী ছাহেবের কথার দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদের একটা সাধনা ছিল এবং সেই সাধনার অপমান করা খুবই অন্যায়। বেশ কথা, এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি— হজরতের সেই সাধনা কি, তাহার মূল কোথায় আর তাহার লক্ষ্য কে? এই কথাগুলি কাজী ছাহেব ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে বোঝা যাইবে, প্রকৃতপক্ষে হজরতের সাধনাকে চরম অপমানে অপমানিত করার গভীর সংকল্প ও কুটিল ষড়যন্ত্রকে কতকগুলি বাহ্য শব্দবিন্যাসের কপট ছদ্মবেশে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, কোন নরাধমের দল?[৪৮]

এই জঘন্য মিথ্যা অপবাদের পর ওদুদ পরবর্তী সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে জবাবদিহি করে বলেন :

> মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব তাঁর "নবপর্য্যায় না নবপর্য্যয়" শীর্ষক আলোচনায় চৈত্রের কিস্তিতে নবপর্য্যায়ের লেখককে দুইটি প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দিতে বলেছেন। তার একটি ৩৪৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ৮ লাইনে, অন্যটি ৩৫১ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের ১১ লাইনে। প্রথমটি অবান্তর, কেননা কোরআন হাদিসের নির্দেশ অনুসরণ করেই মুসলমান সম্মোহিত হয়েছে এটি নবপর্য্যায়ের লেখকের প্রতিপাদ্য নয়। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে হজরত মোহাম্মদের সাধনা ও তাঁর সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত নবপর্য্যায়ের বিভিন্ন লেখায় ও পরে পরের অন্যান্য প্রবন্ধে করা হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও যে এ-সম্বন্ধে আলোচনা চলবে এটি স্বাভাবিক।
>
> বলা বাহুল্য, আধুনিক কালে কোন্ নতুন দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র বাণী মানুষের সাধনা ইত্যাদির দিকে চাইলে তা মানুষের চিত্তের জন্য বন্ধন না হয়ে তার মুক্তির পথ হবে তার অবলম্বন সেই চেষ্টাই নবপর্য্যায়ে করা হয়েছে, — অবশ্য এই চেষ্টার সার্থকতার বিচারক কাল।
>
> মওলানা সাহেব কিছু রোষপরবশ হয়ে নবপর্য্যায়ের আলোচনা শুরু করেছেন তাই অনেক জায়গায় তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছে। সত্য ও কল্যাণ জিজ্ঞাসার পথে এই রোষপরবশতার কি প্রয়োজন আছে বোঝা যাচ্ছে না। তিনি বর্ষীয়ান ব্যক্তি— তাই প্রার্থনা বয়সের অনুযায়ী সত্যদৃষ্টি ও প্রেম তাঁর কাছ থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোক ও দেশের লোক লাভ করুক।
>
> সত্য অনেক সময়ে পাওয়া যায় খনির সোনার মত, — তাকে সংগ্রহ করতে হয় পরম প্রয়াসে। কিন্তু তাতে অসহিষ্ণু হলে শুধু নির্বাসন দেওয়া হয় নিজেরই ভাগ্য।[৪৯]

ওদুদের এই জবাবদিহির পরেও আকরম খাঁ উক্ত পত্রিকায় আরো দুই সংখ্যা এই বিরূপ সমালোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন।[৫০] শুধু তাই নয়, পাশাপাশি *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে* তিনি লিখেছিলেন "ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা"[৫১], যেখানে "সম্মোহিত মুসলমান" প্রবন্ধের লেখককে 'অমুসলমান' 'নাস্তিক' বলে অভিহিত করা হয়। তার প্রতিবাদে ওদুদ ১৯২৭-এর ১৩ই ডিসেম্বর অপর একখানি চিঠি *সাপ্তাহিক মোহাম্মদীতে* পাঠিয়েছিলেন, মোহাম্মদী সেটি ছাপে নি। চিঠিটি পরে *প্রদীপ*-এর ১৩৪১ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। উক্ত চিঠিতে ওদুদ স্পষ্ট বলেন :

> ...'মোহাম্মদী'তে "ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা" শীর্ষক লেখাটি পড়েছি। আমার কয়েকটি কথা বিকৃত করে পাঠকদের সামনে ধরা হয়েছে ও ভুল কথা বলা হয়েছে, সে সমস্তের উল্লেখ করা দরকার।

১। (ক) আমি বলেছি– "সাধারণতঃ মানুষ শাস্ত্র মানে না অথবা মানতে পারে না," আপনারা বলেছেন, কেউ কোরান-হাদিসের ধার ধারে না এই আমার মত। (খ) আমি বলেছি— 'মুসলমান, বিশেষ করে আধুনিক মুসলমান সম্মোহিত বা পৌত্তলিক; আমার "সম্মোহিত মুসলমান" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে তারও ইঙ্গিত দিয়েছি। কিন্তু আপনারা বলেছেন সাহাবীদের কাল থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান সম্মোহিত ও পৌত্তলিক এই আমার মত। — ইসলামের ইতিহাসে অনেক বড় মুসলমানের জীবনের উপরও যে হজরত মোহম্মদের ব্যক্তিত্বের ও বাণীর সম্মোহন প্রবল একথা আমি বলেছি, এখনো বলি; তবে প্রাচীন মুসলমানদের সম্বন্ধে শুধু এই কথাই আমি বলি নি, আরো দুই চারটি কথা বলেছি; আমার মত বলে কোনো কিছুর উপর 'টিপ্পনী' করতে চাইলে সে-সমস্তেরও উল্লেখ করা দরকার।

২। বলা হয়েছে আমি নাস্তিক—যার ছদ্মবেশ এতদিন খুলে গেছে। যে কোনো সাহিত্যিকের কাছে আমার লেখা ফেলে দিলে তিনি বলবেন, আমার লেখার ভিতরে লুকিয়ে ছাপিয়ে কিছুটা বলা হয় নি। তবে আমার ভাষা সাহিত্যের ভাষা, কিছু আলঙ্কারিক। কিন্তু সেটি হয়ত আমার অপরাধই নয়। আমার লেখা যদি কেউ না বোঝেন তার জন্য আমি দুঃখিত; কিন্তু যিনি বলেন তিনি বোঝেন না তাঁর নিজেরও লজ্জিত হবার কারণ থাকতে পারে। আর নাস্তিক আমি নই, নাস্তিকতা বলতে কি বোঝায় সে-কথাটি হয়ত আপনারা ভাল করে ভেবে দেখেন নি।

৩। হজরত মোহম্মদের ভুলের উল্লেখ করেছি তাঁর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কখনো কিছু বলি নি, আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে এটি পুরোপুরি সত্য নয়। 'মোস্তফা-চরিত' বইখানির প্রশংসা করতে পারি নি এই জন্য যে, হজরত মোহাম্মদ মানুষটি কেমন ছিলেন, আধুনিক মুসলমানদের জন্য তাঁর জীবনের কি ইঙ্গিত, এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর তাতে নেই। যুগধর্ম বাদ দিয়ে চিরন্তন ধর্ম হয় না, তাতে করে কতকগুলো কথা বলা হয় মাত্র।

৪। আমাকে অমুসলমান বলেছেন। আমি কি তা পুরোপুরি তিনিই জানেন যিনি আমার স্রষ্টা। অবশ্য আমি মুসলমান কি না একথা প্রমাণ করবার জন্য খুব ব্যস্ত আমি নই, কেননা মুসলমান হিন্দু এসব হচ্ছে মানুষের সামাজিক বা শ্রেণীগত পরিচয়, আর আমি যখন একটি সমাজে বাস করি তখন সেই সমাজের পদবীটি আমার প্রাপ্য একথা প্রমাণ করবার জন্য ব্যগ্রতা অনাবশ্যক। তবে হজরত মোহম্মদ মুসলমান বলতে এক বিশেষ গুণ-সমন্বিত মানুষ বুঝতেন; কিন্তু সে-মুসলমান যে মুখে 'কলেমা' পড়ে ও কাজে জ্ঞানহীনতা ও মিথ্যাচারের পরিচয় দিয়ে হওয়া যায় না সে কথা হয়ত আপনারাও কম বোঝেন না।

...আমরা যে-কথা বলেছি বা বলছি তা— ইসলামসম্মত হোক বা অনৈস্‌লামিক হোক্— জ্ঞানের কথা, সত্য ও কল্যাণ জিজ্ঞাসু মানুষের অন্তরের কথা; তাই তাঁর সঙ্গে মোকাবেলা করা দরকার জ্ঞান দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, গালাগালি দিয়ে নয়। আমরা শুধু জিৎবার জন্যই প্রস্তুত নই, হারবার জন্যও প্রস্তুত, কেননা আমাদের লক্ষ্য সত্য এবং সমাজের ও দেশের কল্যাণ। যদি যোগ্যতা থাকে তবে জ্ঞান দিয়ে আমাদের কথার উত্তর দেবেন। আর যদি সে-যোগ্যতা আপনাদের না থাকে তবে চুপ করে যাবেন কি গালাগালি করবেন সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলার নেই।[৫২]

বলাবাহুল্য, এসব তর্ক-বিতর্কের কারণেও সমসাময়িক শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান সমাজে "সম্মোহিত মুসলমান" প্রবন্ধটি বেশ গুরুত্ব লাভ করে। রক্ষণশীল মুসলমান ও প্রগতিশীল মুসলমান সমাজের মধ্যে আলাদা বিভেদ রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ-প্রবন্ধে ওদুদ জড়তাগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে একটু বেশি করে ঘা দিয়ে জাগাবার যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন সেটিকে রক্ষণশীল দল হাতিয়ার হিসেবে অপ-প্রয়োগ করার প্রয়াস পায়। কিন্তু তাঁদের সে অপপ্রয়োগ যে কত যুক্তিহীন ও ভিত্তিহীন তা কালই প্রমাণ করেছে।

আসলে ওদুদ এ প্রবন্ধটিতে যা বলতে চেয়েছেন তা সত্যিই ভেবে দেখবার মতো। মুসলমান সমাজ, বিশেষত বাংলার মুসলমান সমাজকে চরম অধঃপতন ও পশ্চাৎপদতার ভীতিপ্রদ আবহ থেকে উদ্ধারের লক্ষ্যে ওদুদ এ-প্রবন্ধের অবতারণা করেছিলেন। ঊনিশ শতকের শেষে বিশ শতকের গোড়ার দিকে ওদুদ যখন এ-বিষয়ে ভাবছেন, তখন তিনি দেখতে পান সে-সমাজে অনুসন্ধিৎসা বন্ধ, যুক্তি-বুদ্ধির প্রয়োগ অন্তর্হিত, মনুষ্যত্ব অর্জনের চেষ্টাই নেই; উপলব্ধিহীন অন্ধ অনুবর্তিতা, দরুদ-পাঠ, কোরআন-চুম্বন, শাস্ত্র নিয়ে আন্দোলন এ-ই হয়েছে তাদের ধর্ম। আধুনিক বিশ্বের উপযোগী জীবন-গঠনের প্রয়াস তো নেই-ই, এমনকি সে-প্রেক্ষাপটে 'ইসলামকে সম্পূর্ণ নতুন করে বুঝবার প্রয়োজনীয়তা'ও[৫৩] তারা উপলব্ধি করছে না। এর কারণ হিসেবে ওদুদ মনে করলেন, তারা সম্মোহিত, বশীভূতের মতো তাদের বিচার-বিবেচনাশক্তি লোপ পেয়েছে। তাঁর ভাষায়, 'সে এখন যে অবস্থায় উপনীত তাকে পৌত্তলিকতারও চরম দশা বলা যেতে পারে, — তার মানবসুলভ সমস্ত বিচার-বুদ্ধি, মানস-উৎকর্ষ, আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত! বর্তমান তার জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন, দিগ্‌দেশবিহীন, অতীত ভবিষ্যৎ তার নেই।' অথচ 'জীবনকে সত্যভাবে উপলব্ধি করবার দুর্নিবার প্রয়াসের মুখেই যে উচ্ছ্রিত হয় যুগে যুগে মানুষের বীরত্ব, ত্যাগ, শাস্ত্রজ্ঞান, মনীষা, তার প্রাচীন ইতিহাসে এর যোগ্য প্রমাণের অভাব নেই। হজরত ওমর ও ইবনে জুবেরের মতো বীর-কর্মীদের,

সাদী-ওমর-খাইয়ামের মতো মনীষীদের, গাজ্জালি-রুমির মতো সাধকদের জীবনের অন্তস্থলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ কথা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু জীবনরহস্যের সেই গহনে উঁকি দেবে, এই সম্মোহিতের কাছ থেকে তা আশা করা কত দুরাশা! এ সমস্তই যে তার কাছে শুধু নাম–পঠন-অযোগ্য অক্ষরের মতো কালের পটে কতকগুলো আঁচড়। তার জন্য একমাত্র সত্য শাস্ত্রবচন। অথবা তাও ঠিক নয়; শাস্ত্রবচনের পিছনে যে সত্য ও শ্রেয়ঃ -অন্বেষী মানবচিত্তের স্পন্দনের অপূর্বতা রয়েছে শাস্ত্রবচনের মাহাত্ম্য-উপলব্ধির সেই দ্বার তার জন্য যে রুদ্ধ। প্রকৃত সম্মোহিতের মতো তার জন্য একমাত্র সত্য প্রভুর হুকুম–স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ী প্রভুর হুকুম।'[৫৪] এবং সে হুকুমে সে কখনো স্বপ্ন দেখে প্যান-ইসলামের, কখনো বর্তমান পরিবেষ্টনের কথা বিবেচনা ব্যতিরেকেই বহু বহু বৎসরের পূর্বেকার শাস্ত্রবাক্যের হুবহু প্রবর্তনার।

ওদুদের মতে, এই যে মুসলমান সমাজে সম্মোহনের ভয়ংকর রূপ দাঁড়িয়েছে, সে সম্মোহন অনেক পূর্বেও ছিল; তবে সেটির গ্রহণযোগ্যতা ভিন্ন দিক থেকে। তিনি বলেন, 'মনে হয়, এ সম্মোহনের এক বড় কারণ হজরত মোহাম্মদের মহাজীবনই। সে জীবন তপস্যায়, প্রেমে, কর্মে বিচিত্র ও বিরাট। নানা দুঃখ-দহনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার ফলে প্রখর তার ঔজ্জ্বল্য; তার উপর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মানুষের হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো চিরকালই পৌত্তলিক; কিন্তু হজরত মোহম্মদের ব্যক্তিত্বের এই প্রাখর্যের জন্যই হয়ত মুসলমান ইতিহাসের অনেক শক্তিধর পুরুষও তার সম্মোহনের নাগপাশ এড়িয়ে যেতে পারেন নি।'[৫৫] প্রসঙ্গক্রমে ওদুদ হজরত ওমর ও ইমাম গজ্জালির কথা উল্লেখ করেছেন। এবং এঁরা যে তাঁদের বীর্যবত্তা ও সাধনার পরিপূর্ণতা সত্ত্বেও চূড়ান্ত আদর্শ হিসেবে 'হজরত মোহম্মদের মহাদৃষ্টান্তের' অনুসরণকে সর্বসাধারণের জন্য নিরাপদ ভেবেছিলেন তার যৌক্তিকতা মেনে নিয়েও ওদুদ গজ্জালির মৃদু সমালোচনা করেছেন। গজ্জালি সর্বসাধারণের দর্শন-চর্চাকে বিপজ্জনক বলে মনে করেছিলেন।[৫৬] ওদুদ বলেন, 'গোটা দর্শনচর্চার বিরুদ্ধে তাঁর যে প্রতিবাদ তাতে অত্যন্ত দোষবহ বলা ভিন্ন উপায় নেই। যুক্তিবিচার যতই অপূর্ণাঙ্গ হোক, জীবনপথে বাস্তবিকই এ যে মানুষের এক অতি বড় সহায়। এর সাহায্যের অভাব ঘটলে পূর্বানুবর্তিতা পাষাণভারের মতনই মানুষের জীবনের উপর চেপে বসে, দেখতে দেখতে তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রবাহ শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে আসে'।[৫৭] মূলত এর মাধ্যমে ওদুদ বাঙালি মুসলমান সমাজে যুক্তি-বিচার ও বুদ্ধির চর্চার প্রসার ঘটানোকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং শাস্ত্রানুগত্য ও পূর্বানুবর্তিতাও যেন যথাসম্ভব এর ভেতর দিয়ে আসে, তার কামনা করছেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট বলেছেন :

> মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের কিছুমাত্র বিরোধ নেই। বরং ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ইসলামের যে প্রাণভূত তৌহীদের সাধনা, মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, — বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লাহ্‌কে যে জানতে চায়, তার চিত্তে ভিন্ন বিচার, কাণ্ডজ্ঞান, অপরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুক্তির লক্ষণ আর কোথায় যোগ্যভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। তা ছাড়া ইসলামের তৌহীদের সাধনা জগতে কল্যাণ ও মুক্তির সহায়তা করে এসেছে, ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। তৌহীদে-বিশ্বাসী দার্শনিক ইব্‌নে রোশ্‌দের (Averraes) লেখা থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় চিত্তে শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় সন্দেহ জন্মেছিল, প্রাচীন শাস্ত্রের বন্ধন থেকে বুদ্ধির এই মুক্তির স্থান ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসে অনেকখানি; মধ্যযুগের ঘোর তামসিকতার ভিতরে নানক, কবীর প্রভৃতি ভক্ত সত্যকার আধ্যাত্মিকতার দীপ ভারতে পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন, তাঁদের সামনেও শিখারূপে জ্বলেছিল ইসলামের তৌহীদ ও সাম্যবাদ; আর বাঙালী মুসলমানের জন্য সব চাইতে বড় সুসংবাদ এই যে, ভারতের নবজাগরণে যিনি আদি নেতা সেই মহাত্মা রাজা রামমোহনের উপরে ইসলাম আশ্চর্যভাবে প্রভাবশীল হয়েছিল। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের অবরুদ্ধতা ও নিরুদ্বেগের ভিতরে তিনি যে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন সবল কাণ্ডজ্ঞান, চিন্তা ও কর্মের বিশ্বধারা, সে-সমস্তের যোগ্য প্রেরণা চিত্ত বিকাশের মহা মুহূর্তে তাঁর লাভ হয়েছিল হজরত মোহম্মদের সাধনা থেকে, — তাঁর প্রচারিত তৌহীদ, সাম্য, নরনারী-নির্বিশেষে সবারই জীবনের মর্যাদাবোধ আধুনিক যুগের এই মহাপুরুষের কল্যাণেও মুক্তির পথে অমূল্য পাথেয়েরই কার্য করেছিল। (পৃ. ৮০-৮১)

ওদুদ বরেন : 'আল্লাহ্‌র এ জগৎ বিরাট, অনাদ্যন্ত হর্ষে ক্ষোভে, ব্যথায় আনন্দে এ বিচিত্র, এই বিরাট বাস্তবতার সঙ্গে যে যোগযুক্ত নয় জীবনে শ্রেয়োলাভের আসল দরজা তাঁর জন্য বন্ধ, — নতুন করে এই সত্য আমাদের চিত্তে প্রেরণা সঞ্চার করুক; আমাদের দেহকোষানুসমূহ অক্সিজেন-সংস্পর্শে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধ ও পুনর্গঠিত হয়, এমনি করেই দেহ সবল ও কার্যক্ষম থাকে, আমাদের চিত্তকেও তেমনিভাবে নব নব জ্ঞান ও প্রেরণার দহনে নিরন্তর দগ্ধ ও সঞ্জীবিত করতে হয়, নইলে জড়তার আক্রমণ প্রতিরোধে অসমর্থ হয়ে তা সম্পূর্ণ অকর্মণ্য ও জীবনের পক্ষে অভিশাপের মতো হয়ে দাঁড়ায়, — নতুন করে এ জ্ঞানের দহনে আমাদের সমস্ত জড়তা ভস্মীভূত হয়ে যাক; আর আমাদের চিত্তে বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাস যে, মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধানো রাজপথ নেই, জগৎ যেমন এক স্থানে বসে নেই মানুষও তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনকে নিয়ে একস্থানে স্থির হয়ে নেই— আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন

অন্ধঅনুবর্তিতার নয়, সদাজাগ্রতচিত্ততার। — তাহলে আমাদের চোখের সম্মোহন ঘুচে যাবে। তখন জগতের সঙ্গে আমাদের অপরিচয়ের পর্যায়ের অবসান হবে।'

এ-ভাবে সাধনার পথে বাঙালি মুসলমানও আধুনিক বিশ্বের 'দৃঢ়-মেরুদণ্ড-সমন্বিত অকুতোভয় সৈনিকে' রূপান্তরিত হোক, এই ছিল ওদুদের কাম্য। তিনি আশা করেছিলেন, "ভবিষতে ভীত সম্মোহিত মুসলমানের পরিবর্তে মুক্ত দৃষ্টি ভূমার প্রেমিক মুসলমানকে জগৎ পাবে'। এর দৃষ্টান্তও মুসলমানের ইতিহাসে রয়েছে বলে ওদুদ মনে করেন। তিনি বলেন :

> ...হজরত মোহাম্মদের সাধনার পথে উদার বিচার বুদ্ধি নিয়ে সহজ ছন্দে বেড়ে উঠলে মানুষের জীবনে যে কি অলৌকিক মহিমা প্রকাশ পায়, সৌভাগ্যবশত তার দৃষ্টান্তও মুসলমান-ইতিহাসে খুব বিরল নয়।...বিশ্ববরেণ্য শেখ সাদী এই পুণ্যশ্লোক মুসলমানদের অন্যতম। তাঁর যে-সমস্ত অনাড়ম্বর অথচ প্রাণবন্ত ও বিশ্বাসসঞ্চারী বাণী হজরত মোহম্মদের তৌহীদ ও বিশ্ব-কল্যাণের সাধনাই সে-সমস্তের অন্তরে অন্তরে। কিন্তু হজরত মোহাম্মদের সেই সাধনাকে তিনি গ্রহণ করেছেন ভয়-বিহ্বল হয়ে নয়, অন্ধ অনুবর্তিতার পথেও নয়, সবল মনুষ্য-প্রকৃতি ও উদার বিচার-বুদ্ধির পথে। মনীষী তিনি, সত্যদ্রষ্টা তিনি, মানুষকে তিনি দেখেছেন জাতি-ধর্মের, আচার-আড়ম্বরের সমস্ত আবরণ ভেদ করে, সেই মুক্ত অবিচলিত দৃষ্টিতেই তিনি চেয়েছেন হজরত মোহম্মদের পানে; দেখেছেন, মানুষের বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষার, বেদনা-সম্ভাবনার, কি আশ্চর্য স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য-সাধন সে-জীবনে ঘটেছে, ...সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে তা মানুষের কত অবলম্বনযোগ্য। আবার যদি জ্ঞানে ও মনুষ্যত্বে বিকশিত হয়ে জগতের কাজে লাগবার আকাঙ্ক্ষা মুসলমানের অন্তরে জাগে তখন এই মহামনীষী সাদী হবেন তাঁদের শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। বুদ্ধি বিচার প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল বির্সজন দিয়ে নতজানু হয়ে মহাপুরুষের পায়ে গড় হওয়া যে তাঁরও প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, তাঁর প্রতি সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন হচ্ছে, প্রকাণ্ড এই জগতের উপর দাঁড়িয়ে তাঁর সাধনাকে সমস্ত প্রাণ ও মস্তিষ্ক দিয়ে গ্রহণ করায়, এবং সেই অধিকারে, প্রয়োজন হলে, তাকে অতিক্রম করায়, সেই তত্ত্বের সন্ধান যাঁদের কাছ থেকে নব মুসলিমের লাভ হবে এই শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাদী হবেন তাঁদের অন্যতম। (পৃ. ৭৬-৭৭)

সে-সঙ্গে ওদুদ পাদটীকায় সাদীর একটি বাণী উদ্ধৃত করেছেন, যার অর্থ, 'সৃষ্টির সেবা ভিন্ন ধর্ম আর কিছু নয়। তস্‌বিহ্ জায়নামাজ ও আল খাল্লায় ধর্ম নাই।' সম্ভবত রাজা রামমোহনেরও এটি প্রিয়বাণী বলে ওদুদ জানান।[৫৯]

প্রবন্ধের শুরুতে ওদুদ বলেছেন, 'হজরত মোহম্মদ যে একজন মহাপুরুষ অর্থাৎ, সত্য তিনি শুধু কথায় প্রচার করেন নি তার তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরে এক আশ্চর্য-দৃঢ় রূপ লাভ করেছিল'। এর পরেই ওদুদ বলেন, মহাপুরুষ 'সর্বজ্ঞ নন, মানুষের সর্বময় প্রভু নন, মানুষের জীবন-সংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র', 'তাঁর কথা ও চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে' 'চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেননা, সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহর উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়— যে আল্লাহ চিরজাগ্রত, চিরবিচিত্র, বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় যাঁর মহিমা প্রকটিত হজরত মোহম্মদের অনুবর্তীরা সেই প্রাণপদ সদাস্মর্তব্য কথা অদ্ভুতভাবেই মন থেকে দূর করে দিয়েছেন'।[৬০] অর্থাৎ *মানব মুকুট* আলোচনা প্রসঙ্গে ওদুদ যেমন মানুষরূপে হজরতের সাধনাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এখানেও একই কথা। এর অতিরিক্ত হজরতের 'প্রেরিতত্বে' সম্মোহিত মুসলমানের যে ভয়বিহ্বল অবরুদ্ধতা, সেটিকে তিনি এ-প্রবন্ধে 'এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সামনে নতদৃষ্টি হয়ে' জীবনপাত বলে মনে করেছেন।[৬১] কেননা তাঁর দৃষ্টিতে এটি হজরতের আদর্শ নয়। ওদুদ বলেন :

মানুষের সাষ্টাঙ্গ প্রণামকে পর্যন্ত এই মহাপুরুষ গ্রহণ করেন নি। আর তাঁর আবিষ্কৃত যে বজ্রসার তৌহীদ (একেশ্বরতত্ত্ব), তাঁর অবলম্বিত যে আশ্চর্য অনাড়ম্বর সাংসারিক জীবন, আগ্নেয় সাম্যবাদ, আল্লাহ্‌র পানে সে- সমস্তের যে প্রচণ্ড আকর্ষণ, কিসের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। কিন্তু তাঁর মাহাত্ম্য যত বড়ই হোক, একথা অস্বীকার করবার কিছুমাত্র উপায় নেই যে, সেই আল্লাহ্‌র উপলব্ধি, অন্য কথায়, সমস্ত জগতের সঙ্গে প্রেম ও কল্যাণের যোগের উপলব্ধি, আজ তাঁর অনুবর্তীদের দৃষ্টির সামনে নেই। — জীবনের অর্থই যেন আধুনিক মুসলমান বোঝে না। বুদ্ধি, বিচার, আত্মা, আনন্দ, এ সমস্তের গভীরতার যে আস্বাদ তা থেকে তাকে বঞ্চিত ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। (পৃ. ৭১)

এ-ভাবে ওদুদ হজরতের জীবনাদর্শ ও আল্লাহর চেতনার বিশেষ উপলব্ধি প্রকাশের মাধ্যমে সবল মনুষ্য প্রকৃতি ও মুক্ত বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন আধুনিক মুসলমান সমাজ গড়ে তুলবার পক্ষে ছিলেন। বাংলার জড়তাগ্রস্ত মুসলমানের জীবন-সাধনা তাঁর সেই উপলব্ধির পথ বেয়ে যাতে নবজাগরণের ছোঁয়া পায়— এ-ই ছিল ওদুদের কামনা।

৮

নবপর্য্যায় [১ম খণ্ড]-এর উপসংহার দিতে হয় ওদুদেরই ভাষায়; "বাদ-প্রতিবাদ" শীর্ষক আলোচনায় তিনি বলেছেন, 'সেখানে মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা, বুদ্ধির মুক্তি (Emancipation of the Intellect), বর্তমানে মুসলমানের শিক্ষার দোষ, ইসলামকে সম্পূর্ণ নূতন করে বুঝবার প্রয়োজনীয়তা, ইত্যাদি কথা বলা হয়েছে। ওদুদের এ-সব চিন্তার মূলে রয়েছে মানব বুদ্ধি ও মানব-কল্যাণ; কেননা, তাঁর মতে, 'মুসলমান সমাজও যে মানুষের সমাজ।' যদিও সে-উপলব্ধির অভাবই সে-সমাজে সবচেয়ে প্রবল।

ওদুদ যখন এ-সব ভাবছেন, তখন তাঁর সামনে বাংলার মুসলমান সমাজের কি চেহারা ফুটেছে? ওদুদ বলেন, "সেখানে দেখেছি অনুসন্ধিৎসা বন্ধ, মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকে কিছু মাত্র দৃষ্টি নেই, আর ধর্ম হচ্ছে দরুদ-পাঠ, কোরআন-চুম্বন, আর শাস্ত্র নিয়ে আস্ফালন। এরই মধ্যে দুই-একজন আলেম অথবা তাঁদের সাগরেদ ইসলামের আদর্শ "ইসলামের সার্বজনীনতা" ইত্যাদি দুই-একটি গুরুগম্ভীর বচন আওড়াচ্ছেন; কিন্তু মনুষ্যত্বের অর্থাৎ সুন্দর ও সাধু জীবনের জন্মবেদনা থেকে এ-সমস্তের উদ্ভব নয়; এ সমস্তের মূলে রয়েছে 'সম্মোহন' আর অনুকরণ— আধুনিক প্রতিক্রিয়াধর্মী হিন্দু যে প্রাচীন শাস্ত্রের মাহাত্ম্য অনেকখানি গলার জোরে ঘোষণা করতে চাচ্ছেন তারই অনুকরণ। 'মজহাব-পন্থী আর 'পীর-পরস্তের' দল কিছুদিন আগে পর্যন্ত মুসলমান সমাজের সর্বত্র প্রবল ছিলেন; তখন তাঁরা সমাজের সদর আঙিনায় আসর আর তেমন জমাতে পারছেন না, যদিও ভিতরে ভিতরে তাঁদের প্রভাব এখনো অত্যন্ত প্রবল।"[৬৩] সমাজের এ-অবস্থায় ওদুদ সে-সমাজে তথাকথিত 'যুক্তিবাদী শরিয়ৎপন্থী'দের ওপরও আস্থা রাখতে পারছেন না, কারণ তাঁদের "যুক্তিবাদ যে কত অসম্পূর্ণ ও নিরর্থক তার এক বড় প্রমাণ মওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের বিরাটকায় 'মোস্তফা-চরিত'। সেখানে সহি হাদিস নির্ণয়ের চেষ্টা বেশ আছে, পাদ্রীদের ধোঁকা-ভঞ্জনের চেষ্টা তার চাইতেও বেশী আছে, কিন্তু নেই মানুষ-মোহম্মদের চরিত্র; কেমন করে তাঁর চিত্র-কোরক দিনে দিনে বিকশিত হয়েছে, কেমন করে তিনি পরিজনকে ভালবেসেছেন, মানুষকে ভালবেসেছেন, কেমন করে তাঁর আদর্শ বুকে ধরে সর্বস্ব-পণে অগ্রসর হয়েছেন, অনন্ত অত্যাচার অবিচার প্রেম ও ক্ষমার অতলে নিমজ্জিত করেছেন— অর্থাৎ মানুষের মনুষ্যত্ব যখন জাগে তখন তা কেমন করে এমনিভাবে সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের শীর্ষে জীবনের অপরূপত্ব ফুটিয়ে তোলে—

নেই সেই-সমস্ত কথা।"[৬৪] অন্যদিকে ওদুদের কাছে— যাঁরা মুসলমান সমাজে সেই সময়কার সাহিত্যিক তাঁদের একটুও মনে আশা হয় না যে বাংলার মুসলমানের চিত্তে কোন দিন সত্যের সন্ধান, জীবনের আস্বাদলাভ, এসব জিনিষ জাগবে।'[৬৫]

অতএব, সমাজের এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মুসলমানদের মুক্তির ও জগতে তাঁদের সার্থক হবার ছবির দিকেই ওদুদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল,[৬৬] যারই ফল *নবপর্য্যায়*। বলাবাহুল্য, শুধু নবপর্য্যায় কেন, ওদুদের অপরাপর প্রবন্ধসমূহের অধিকাংশই সেই চেতনার ফল।

তথ্যনির্দেশ

১ শুরুতে বইটির বানান ছিল নবপর্য্যায়। দ্র. কাজী আবদুল ওদুদ, নবপর্য্যায় (কলিকাতা : মোসলেম পাবলিশিং হাউস, ১৩৩৩)। পরে শাশ্বত বঙ্গে সংকলনের সময় ওদুদ বানানে দ্বিত্ব বর্জন করে লেখেন *নবপর্যায়*।

২ গ্রন্থের 'সূচী'র পূর্বপৃষ্ঠায় নামকরণ-প্রসঙ্গ টেনে ওদুদ স্বাক্ষরের সঙ্গে যোগ করেন 'ঢাকা/আষাঢ়, ১৩৩৩' ; দ্র. ঐ।

৩ মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর *মানব-মুকুট* গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে ওদুদ এই উক্তি করেন; ঐ, পৃ. ৩৫। উক্তিটি তাঁর নিজের গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪ ঐ, পৃ. ২৩-২৪।

৫ কাজী আবদুল ওদুদ, *নানা কথা, কাজী আবদুল ওদুদ-রচনাবলী* ২য় খণ্ড (ঢাকা, ১৯৯০) পৃ. ৩০৮।

৬ ঐ, পৃ. ৩০৮, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫ প্রভৃতি দ্র.।

৭ ঐ, পৃ. ৩১৭ (৪ নভেম্বর ১৯২৬-এর ডায়েরি)।

৮ মোতাহের হোসেন চৌধুরী, "বাঙালী মুসলমানের দৈন্য", *সওগাত*, মাঘ ১৩৩৭।

৯ পৃ. ১৫। মোহাম্মদ ইদ্‌রিস আলী, "কাজী আবদুল ওদুদ", *সাহিত্য পত্রিকা* কার্তিক ১৪০১ পৃ. ১৫।

১০ ওদুদের ১১-২-১৯২৬ তারিখের দিনলিপি "ডায়ারির এক পৃষ্ঠা" নামে *নবপর্যায়* ২য় খণ্ডে (কলিকাতা, ১৩৩৬) দ্র.।

১১ *প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩৩৩, পৃ. ৯৪০।

১২ *সাহিত্য পত্রিকা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭। ড. মুহম্মদ এনামুল হক লিখেছেন :

বাংলা দেশে মওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) ও মওলানা আকরম খানের (জন্ম ১৮৭৭) নেতৃত্বে এই খিলাফত আন্দোলন পরিচালিত হয়...কিন্তু

মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ আন্দোলনের বেগ মন্দীভূত হয়ে এল, কারণ আস্তে আস্তে মুসলমানদের নিকট এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে পার্থিব ক্ষমতাচ্যুত খলিফা খৃস্টান জগতের পোপের নামান্তর বই আর কিছু নয়। এ অবস্থা মুসলমানদের মোটেই কাম্য ছিল না।

যখন পাক-ভারত উপমহাদেশীয় মুসলমানদের মনে এ ধারার উন্মেষ ঘটল তখন বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা নগরীর বুকে ১৯২৬ সালের জানুয়ারীতে একজন প্রখ্যাত সাহিত্য-চিন্তাবিদ জনাব কাজী আবদুল ওদুদ একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঢাকার "মুসলিম সাহিত্য পরিষদ" নামক একটি সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে কাজী সাহেব যে প্রবন্ধ পাঠ করে শুনিয়েছিলেন তার শিরোনামা ছিল "মুস্তফা কামাল সম্পর্কে কয়েকটি কথা"। এই প্রবন্ধে তিনি মুস্তফা কামালের ধর্মীয় সংস্কারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন। পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্যের অবতারণা করে লেখক মুস্তফা কামালকে সৃজনশীল দৃষ্টি ও অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন সংস্কারক হিসাবে অভিনন্দিত করেন। উপসংহারে লেখক আশা প্রকাশ করেন যে তাঁর দেশবাসী এখন সম্ভবতঃ মুস্তফা কামালের হানা আঘাত ভুলে যেতে সমর্থ হবেন এবং নিজেদেরকে কর্মে প্রবৃত্ত করতে পারবেন।...মুস্তফা কামালের ধর্মীয় সংস্কার বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রকৃতি ও আঙ্গিক গঠনের বেলায়ও এক বিরাট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

"বাঙালী মুসলিম মানসে তুর্কী বিপ্লবের প্রভাব", ইতিহাস, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৫, পৃ. ৬-৭।

১৩ এনামুল হক, ঐ, পৃ. ১।

১৪ *নবপর্য্যায়,* পূর্বোক্ত, পৃ/ ৭। এভাবে 'মুসলমানদের জাতীয়তাবাদ, ইসলামবাদ ও যা কিছু তাদের কাম্য আতাতুর্ক তার একটা জ্বলন্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।' এনামুল হক, ঐ, পৃ. ১৩।

১৫ *নবপর্য্যায়,* পৃ. ১০।

১৬ ঐ, পৃ. ১১।

১৭ ঐ, পৃ. ১ : 'তুর্ক-সুলতানের সিংহাসন-চ্যুতি, কামালের পত্নীর পর্দাহীনতা এবং তাঁর এ রকম আরো ছোট-খাটো 'অনৈসলামিকতা'র ভিতর দিয়ে ক্রমে আমাদের ধৈর্য পরীক্ষা শুরু হলো।" তুলনীয়: এনামুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫-৬। *ধূমকেতু* পত্রিকায় নজরুলের "কামাল" শিরোনামের সম্পাদকীয় পড়ে 'ইসলাম দর্শন' পত্রিকায় লেখা হল. 'খাঁটি ইসলামি আমলদারি থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চয়।' –উদ্ধৃত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সমকালে নজরুল ইসলাম* (ঢাকা, ১৯৮৩) পৃ. ১৮।

১৮ প্রবন্ধটি ধূমকেতু ৩০ আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যায় ও কবিতাটি *মোসলেম ভারত* কার্তিক ১৩২৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়; গোলাম মোস্তফার কবিতা দুটি *মোহাম্মদী* ২৯ অক্টোবর ১৯২১ ও ৫ আশ্বিন ১৩২৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং বেনজির আহমদের প্রবন্ধটি *মোহাম্মদীর* পৌষ ১৩৪৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৯ তুলনীয় : "এর গলদ এইখানে যে এদের ভ্রাতৃভাবের মূলকথা "ধর্ম" — অর্থাৎ সেকেলে ধর্ম, বিশ্বমানবতাকে এরা তেমন স্বীকার করছে না। এরই সঙ্গে Rolland-এর International Leggce of intelectuals এর তুলনা করলে এর গলদ স্পষ্ট ধরা পড়বে। আজকালকার জগতে সবারই সঙ্গে সবার পরিচয় হচ্ছে এং সেই পরিচয় হতে বিরাট প্রাণের উপরই একটা বড় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, কিন্তু Pan-Islamism যুগ-ধর্মের বিরোধী। এতে মুসলমান জগতে এ-যুগের মাঝে ঠিক খাপ খাইয়ে চলতে পারবে না।" – *নানা কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০২। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মনীষী ড. ইকবালও এই Pan-Islamism -এর বিপক্ষে ১৯৩৩-এ স্যার ফজল-ই-হোসাইনকে সমর্থন করে বলেছিলেন, 'Sir Fazl-i-Hussain is perfectly correct when he says that political Pan-Islamism never existed.' –Speeches and Statements of Iqbal, Compiled by SHAMLOO, (2nd end edn; Lahore, 1948) p. 204.

২০ *নবপর্য্যায়*, পৃ. ৪।

২১ ঐ, পৃ. ৫।

২২ ঐ, পৃ. ১৯।

২৩ ঐ, পৃ. ১৮।

২৪ ঐ, পৃ. ১৬-১৭।

২৫ ঐ, পৃ. ২০।

২৬ দ্র. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, *মানব-মুকুট* (প-স; কলিকাতা, ১৯৫৩)।

২৭ ওদুদ, "মানব-মুকুট", *নব-পর্য্যায়*, পৃ. ২৩-২৪।

২৮ ঐ, পৃ. ৩১-৩২।

২৯ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (তৃ-মু; ঢাকা, ১৯৮৩) পৃ. ২৯৭-৯৮।

৩০ *নবপর্য্যায়,* পৃ. ২৭।

৩১ উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ২৮-২৯।

৩২ ঐ, পৃ. ৩৫।

৩৩ ঐ, পৃ. ৩৪।

৩৪ ঐ, পৃ. ৩৫।

৩৫ ঐ, পৃ. ২৪।

৩৬ ঐ, পৃ. ২৫।

৩৭ ঐ, পৃ. ৩৩।

৩৮ "পণ্ডিত সাহেব", *নবপর্য্যায়,* পৃ. ৪৪।

৩৯ ঐ, পৃ. ৪৬।

৪০ ঐ, পৃ. ৪২।

৪১ ঐ, পৃ. ৪৪ (পণ্ডিত সাহেবের উক্তি)।

৪২ "কাজি ইমদাদুল হক স্মরণে", ঐ, পৃ. ৫৫-৫৬।

৪৩ আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬১।

৪৪ ঐ, পৃ. ৩৬৩।

৪৫ "সৃষ্টির কথা", *নবপর্য্যায়,* পৃ. ৬৫।

৪৬ "নব-পর্য্যায় না নব-পর্য্যায়", *মাসিক মোহাম্মদী,* ফাল্গুন ১৩৩৪, পৃ. ২৭৪।

৪৭ "সম্মোহিত মুসলমান", *নবপর্য্যায়,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮।

৪৮ "নবপর্য্যায় না নব-পর্য্যায়", মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৩৪, পৃ. ৩৪৮, ৩৫৯।

৪৯ "জবাব দিহি", *মাসিক মোহাম্মদী,* বৈশাখ ১৩৩৫, পৃ. ৪৫৬।

৫০ "নব-পর্য্যায় না নব-পর্য্যয়", *মাসিক মোহাম্মদী,* বৈশাখ ১৩৩৫, পৃ. ৩৯৪; এবং জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ. ৪৯৯।

৫১ "ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা", *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী,* ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৪। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য, ইতঃপূর্বে ওদুদ *ছোলতানে* প্রকাশিত (১৬ নভেম্বর ১৯২৭) "ঢাকা তরুণ দল" শীর্ষক একটি লেখার জবাবে উক্ত পত্রিকার ৩০ নভেম্বর সংখ্যায় একটি চিঠি লিখেছিলেন, সেটি দেখে *সাপ্তাহিক মোহাম্মদী* এই' ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা" বের করেন।

৫২ এটি পরে *শাশ্বত-বঙ্গে* "নব পর্যায়ের পরিশিষ্ট" হিসেবে ছাপা হয়; দ্র. "বাদ-প্রতিবাদ", শাশ্বত বঙ্গ পৃ. ৪০৬-৭।

৫৩ কাজী আবদুল ওদুদ থেকে উদ্বৃত, ঐ পৃ. ৪০২।

৫৪ "সম্মোহিত মুসলমান", *নবপর্য্যায়*, পৃ. ৭২-৭৩।

৫৫ ঐ, পৃ. ৭৩-৭৪।

৫৬ Confessions of AL Ghazzali নামক পুস্তকের সূত্র ধরে ওদুদ বলেন, গাজ্জালি দর্শনচর্চার বিরুদ্ধে অদ্ভুত যুক্তি দেন এভাবে, সাপুড়ে তার অল্পবয়স্ক পুত্রের সামনে সাপ খেলায় না এ-ভয়ে যে, সে তার বাপের অনুকরণ করতে গিয়ে বিপদ ঘটাবে, তেমনি সর্বসাধারণের জন্য দর্শন-চর্চাও এরূপ বিপজ্জনক। ঐ, পৃ. ৭৪।

৫৭ ঐ, পৃ. ৭৫।

৫৮ ঐ, পৃ. ৭৮-৭৯।

৫৯ ঐ, পৃ. ৭৭; পাদটীকায় 'নগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত রামমোহনের জীবনী ৫২৪ পৃষ্ঠা (চতুর্থ সংস্করণ) দ্রষ্টব্য' বলে উল্লিখিত।

৬০ ঐ, পৃ. ৭০-৭১।

৬১ ঐ, পৃ. ৭১। ওদুদ চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজকে সব-প্রকারের জড়তা ও মোহগ্রস্ততা থেকে মুক্ত করতে, কিন্তু রক্ষণশীলরা একেই ওদুদের বিরুদ্ধে মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, মওলানা আকরম খাঁর বক্তব্যই তার প্রমাণ।

৬২ ঐ, পৃ. ৪০৩।

৬৩ ঐ, পৃ. ৪০৪।

৬৪ *নানা কথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০ (৩০.১০.১৯২৭ তারিখের দিনলিপিতে ওদুদ লেখেন) ঃ "শুধু কোরআন ও মোহম্মদকে ভালবাসলেই কাজ হয় না, জীবন-রহস্যের সমাধানের দিক থেকে যদি এই ভালবাসার উদ্ভব হয় তবেই কোরআন ও মোহম্মদ-প্রীতি থেকে সত্যকার কল্যাণ সম্ভবপর। অন্য কথায় জীবন রহস্যের বোধই আমাদের ভিতরে প্রবলভাবে চাই, তারই আনুষঙ্গিক ভাবে আসবে কোরআন মোহম্মদ সুফী-সাধনা, বৈষ্ণব-সাধনা, ইয়োরোপীয় সাধনা ইত্যাদি। কিন্তু হায় এই জীবনকে আস্বাদ করবার আকাঙ্ক্ষা মুসলমান সমাজে কোথায়। যারা মুসলমান সমাজে আজকালকার সাহিত্যিক...বাংলার মুসলমানের চিত্ত...জীবনের আস্বাদ লাভ..জাগবে।' এটি "ডায়ারির ছেঁড়া পাতা" নামে *সওগাত*, ফাল্গুন ১৩৩৬, সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল।

৬৫ "বাদ-প্রতিবাদ", *শাশ্বত বঙ্গ*, পৃ. ৪০৪।